সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● তৃতীয় বর্ষ বিশেষ সংখ্যা ● নভেম্বর ২০১৬ ● শুভেচ্ছা মূল্য

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে ২৬ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশ

হামলা নির্যাতন যতই আসুক, আন্দোলন থামবে না

হামলা-মামলা-বাধা উপেক্ষা করে সুন্দরবন রক্ষার জন্য এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য - বিশ্লেষণকে গায়ের জোরে এক কথাতেই উড়িয়ে দিয়েছে সরকার। মন্ত্র জপার মতো এক কথাই তার - 'না, কোনো ক্ষতি হবে না'। কিন্তু ক্ষতি তো মুখের কথার উপর নির্ভর করে না। সুন্দরবন সাধারণ কোনো বন নয়, কতগুলো গাছ-প্রাণীর সমাবেশ নয়; দারুণ এক জীব বৈচিত্র্যের আধার। যার সাথে আমাদের বেঁচে থাকার সম্পর্ক। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া, জীবিকা – সবকিছুই জড়িত এর সাথে। ফলে যে কোনো মূল্যে একে রক্ষা করতেই হবে। এ প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে আন্দোলন। বহু চড়াই উৎরাই, বহু কর্মসূচির ধাপ পেরিয়ে আগামী ২৬ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশ। দিকে দিকে আওয়াজ উঠছে 'চলো চলো ঢাকা চলো'।

কেন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান

সরকারি হিসাবে সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পোড়ানো হবে তা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, ছাই, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি আশেপাশের বায়ু, পানি, মাটিকে দূষিত করবে। এই দূষণ পানি ও বাতাসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনকে বিপন্ন করবে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ কয়লা বহনকারী জাহাজ আসা-যাওয়া করবে বনের ভেতর দিয়ে। ২০১৪ সালে শ্যালা নদীতে একটি তেলবাহী জাহাজডুবিতে সুন্দরবনের বিপন্ন দশা আমরা দেখেছি। কয়লার বিষক্রিয়ায় ধীরে ধীরে সুন্দরবনের মৃত্যু হলে সারা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় দক্ষিণাঞ্চল তো বটেই, বাংলাদেশের বিরাট অংশ অরক্ষিত হয়ে পড়বে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতীয় কোম্পানির সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তগুলোও অসম এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী, উৎপাদিত বিদ্যুতের দামও পড়বে বেশি। বিদ্যুৎ আমাদের দরকার - এটা ঠিক। সে জন্য বহু বিকল্প আছে। কিন্তু সুন্দরবন বিপন্ন করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আমাদের সায় নেই।

বহুল সমালোচিত এই প্রকল্প নিয়ে ইতোমধ্যে শুধু দেশে নয়, ইউনেস্কো-রামসারসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাও প্রকল্পটি বাতিলের জন্য জোরালোভাবে মত দিয়েছে। অথচ, প্রধানমন্ত্রী একহাতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার নিচ্ছেন, অন্য হাতে সুন্দরবনের জন্য বিপজ্জনক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন।

রামপাল প্রকল্পের সর্বশেষ পরিস্থিতি

'জলবায়ু পরিবর্তন', 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' ও 'পরিবেশ দূষণ' নিয়ে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক শোরগোল। জোর আওয়াজ উঠেছে, বনাঞ্চল এবং পরিবেশ রক্ষার। এর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। 'কার্বন' বেচা-কেনা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের সরকারও আন্তর্জাতিক ওইসব বরাদ্দের ভাগ চাইতে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। এমনই একটি সময়ে, সরকারের একটি পরিকল্পনার কারণে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আমরা কথা বলছি।

২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকেই রামপালে ১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের দাখিল করা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বা 'এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট' (ইআইএ) রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। অথচ, এই রিপোর্টের ওপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে উপস্থিত বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো রিপোর্টটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে। অবশ্য, পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার বহু পূর্বেই সরকার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত করে এনেছে। ২০১৩ সালে প্রকল্প থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়েছে। জনমত উপেক্ষা করে মিথ্যাচার ও জবরদস্তির আশ্রয় নিয়ে গত জুলাই মাসে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে গণবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কয়লা কতটা কালো

পরিবেশ দূষণে কয়লার ভূমিকা শীর্ষস্থানে। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বড় ঘাতক কার্বন, যার বড় অংশই নির্গত হয় কয়লা থেকে। তারপরও বিভিন্ন দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব অণুধাবন করে উন্নত দেশসমূহ এখন দূষণমুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। সম্প্রতি ব্রিটেন ২০২২ সালের মধ্যে তার দেশে সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। আমেরিকা প্রায় তিনশত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জার্মানিতে ৩.১ গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট আর কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ করা হবে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, যত উন্নত প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হোক না কেন, নিরাপদ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ (clean coal energy) বলে কিছু নেই। পরিবেশের ক্ষতির মানদণ্ড বিচারে এগুলো এখনো লাল তালিকাভুক্ত (red catagory)।

কয়লার ক্ষতি কতটা তার কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছে ভারতীয় প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য হিন্দু' ২০১৩ সালের ১১ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। ভারতের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপরে গবেষণা চালিয়ে মূল প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে আরবান ইমিশনস ডট ইনফো এবং গ্রিনপিস ইন্ডিয়া নামে দুটি সংস্থা। গবেষণাটি করেছেন বিশ্বব্যাংকের দূষণ বিষয়ক বিভাগের সাবেক প্রধান সরথ কে. গুটিকুন্ডা ও পূজা জাওহার। এতে দেখা গেছে, ভারতের ১১১টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে প্রতি বছর গড়ে ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু এবং গড়ে ২ কোটি মানুষ অ্যাজমায় আক্রান্ত হচ্ছে। টাকার অঙ্কে এ ক্ষতির পরিমাণ সাড়ে তিন থেকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার। অকাল মৃত্যুর পাশাপাশি হৃদরোগ, ব্রংকাইটিসসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুসহ অন্যরা। 'গ্রিন রেটিং প্রজেক্ট অফ ইন্ডিয়া'র মতে, ভারতে এনটিপিসির অধীনে রয়েছে ২৫টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর মধ্যে ছয়টি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এসব নানা কারণে ভারত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রদেশ গুজরাটেই সৌরবিদ্যুতের বিরাট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আর গত কয়েক বছরে ভারতের কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে তিনটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল হয়েছে *(দ্য হিন্দু, ২৫ মে ২০১২)*।

যে ভারতীয় এনটিপিসি বাংলাদেশে সুন্দরবনের পাশে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে সেই ভারতেরই 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশান অ্যাক্ট ১৯৭২ অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে এবং ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রণীত পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ গাইড লাইন ম্যানুয়াল ২০১০ অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ২৫ কি.মি'র মধ্যে কোনো বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জৈববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্য কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা চলবে না। ভারতীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের 'তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন, ১৯৮৭' অনুসারেও কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিমি'র মধ্যে কোনো কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায় না। অর্থাৎ এনটিপিসিকে বাংলাদেশে সুন্দরবনের যত কাছে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে দেয়া হচ্ছে, তার নিজ দেশ ভারতের আইন অনুযায়ী তা তারা করতে পারতো না!

বর্তমানে চীন বিশ্বের সবচেয়ে কয়লা ব্যবহারকারী এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ৩০ বছরে চীনে অতিমাত্রায় কয়লা পোড়ানোয় দেশটির উত্তরাঞ্চলে মানুষের গড় আয়ু কমেছে ৫ দশমিক ৫ বছর। বেঁচে থাকার সুযোগ কমে আসায় বছরে চীনের ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন বছর নষ্ট হচ্ছে। এর আর্থিক মূল্য কতটা তা সহজেই অনুমেয়। 'প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স অব ইউএসএ' পরিচালিত গবেষণাটি ২০১৩ সালের জুলাইয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। চীনের বিখ্যাত শহর সাংহাইয়ে কয়লা পোড়ানো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর '১৩ সাংহাই পরিবেশ রক্ষা ব্যুরো ভয়াবহ দূষণ ঠেকাতে চার বছরের জন্য কয়লা পোড়ানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেখানে বলা হয়েছে, সাংহাইয়ে অবস্থিত শিল্প খাতের ৩০০টি সহ ২ হাজার ৮০০ কয়লা চুল্লিকে বিকল্প জ্বালানিতে রূপান্তর করতে হবে ২০১৫ সালের মধ্যে। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে দূষণ কমে, কিন্তু বন্ধ করা যায় না

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের রোন কাউন্টিতে অবস্থিত ১৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন 'কিংস্টন ফসিল পাওয়ার প্ল্যান্ট'টি এমোরী এবং ক্লিঞ্চ নদীর মোহনায় অবস্থিত। ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে দুটো নদীতে এবং আশেপাশের এলাকায় দূষণ ছড়িয়েছে। সে দেশেরই টেক্সাসের ফায়েত্তি কাউন্টিতে ১৯৭৯ সালে নির্মিত ১২৩০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১৯৮০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নিঃসৃত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস বিশেষত সালফার ডাই অক্সাইডের বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতের গাছ আক্রান্ত হয়েছে, বহু পেকান বাগান ধ্বংস হয়েছে, অন্তত ১৫ হাজার বিশালাকৃতির পেকান গাছ মরে গিয়েছে। এবং এই ক্ষতিকর প্রভাব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এমনকি ৪৮ কি.মি দূরেও পৌঁছেছে। কিছুদিন আগে শ্রীলংকার সরকার ত্রিনকোমালী শহরের বিদ্যুকেন্দ্রটি মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি করবে - এ আশঙ্কায় ভারতীয় এনটিপিসি কোম্পানির সাথে চুক্তি বাতিল করেছে।

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপদ

রামপালে কয়লা পুড়বে বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাজার টন, প্রতিদিন ১৩ হাজার মেট্রিক টন। ছাই হবে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। এতে বায়ু, পানি, শব্দ দূষণসহ নানা ধরণের দূষণ ঘটবে।

ক) বায়ু দূষণ : বিদ্যুকেন্দ্রের কারণে প্রতি বছরে বর্জ্য হিসেবে যা যা উৎপাদিত হবে তা হলো:

নাম	পরিমাণ	ক্ষতির বিবরণ
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	প্রায় ৭৯ লক্ষ টন	বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা প্রায় ৩৪ কোটি গাছ কেটে ফেলার সমান
সালফার-ডাই-অক্সাইড	৫২ হাজার টন	যা এসিড বৃষ্টির কারণ, ফুসফুস ও হার্টের রোগ সৃষ্টি করে
নাইট্রাস অক্সাইড	৩১ হাজার টন	ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি করে, শ্বাসতন্ত্রে রোগ সৃষ্টি করে
বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র কণিকা	১৩০০ টন	ব্রংকাইটিসসহ ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে
কার্বন-মনো-অক্সাইড	১৯০০ টন	মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা দেয়
পারদ	৪৪০ পাউন্ড	১ চামচ ব্যবহারেই ২৫ একর পুকুরের পানি বিষাক্ত হয় ও মাছ মারা যায়
আর্সেনিক	৩৩০ পাউন্ড	আর্সেনিকোসিস ও ক্যান্সারের বিস্তার ঘটায়
সিসা	৩০০ পাউন্ড	শ্বাসতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে

খ) কঠিন ও তরল বর্জ্যের দূষণ : কয়লা পুড়িয়ে ছাই তৈরি হয় এবং কয়লা ধোয়ার পর পানির সাথে মিশে তৈরি হয় আরেকটি বর্জ্য তরল কয়লা বর্জ্য। ছাই এবং এই তরল উভয় বর্জ্যই বিষাক্ত কারণ এতে বিষাক্ত আর্সেনিক, মার্কারি বা পারদ, ক্রোমিয়াম এমনকি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থাকে। ছাই বা ফ্লাই এ্যাশকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটে অ্যাশ পন্ড বা ছাইয়ের পুকুরে গাদা করা হয় এবং স্লারি বা তরল বর্জ্যকে উপযুক্ত ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দূষণ মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ছাই বাতাসে উড়ে গেলে, ছাই ধোয়া পানি চুইয়ে কিংবা তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে বা নদীতে মিশলে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ ঘটে। একটি ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন Fly Ash এবং ২ লক্ষ টন Bottom Ash উৎপাদিত হবে যার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি বড় সমস্যা।

গ) পানি দূষণ : কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কঠিন ও তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে, সংরক্ষণ আধার থেকে চুইয়ে নানানভাবে গ্রাউন্ড ও সারফেস ওয়াটারের সাথে মিশে পানি দূষণ ঘটায় যার ফলে পানির মাছ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হুমকির মুখে পড়ে।

ঘ) শব্দ দূষণ : কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন, কমপ্রেসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি, পরিবহনের যানবাহনের মাধ্যমে ব্যাপক শব্দ দূষণ ঘটে থাকে। এ সকল কারণেই আবাসিক এলাকা, কৃষিজমি এবং বনাঞ্চলের আশপাশে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করা হয় না।

(ঙ) সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহনের ক্ষতি : আমদানিকৃত কয়লা পরিবহন করা হবে সুন্দরবনের ভেতরে প্রবাহিত পশুর নদী দিয়ে। কয়লা থেকে অত্যাধিক পরিমাণে কার্বন কণা নির্গত হয়, যা পরিবহনের সময় আশেপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এই বিপুল পরিমাণ কয়লা জাহাজে পরিবহনের সময় যে শব্দ ও বর্জ্য উৎপন্ন করবে তা সুন্দরবনের নদী-নালা, খাল-বিলসহ গোটা পরিবেশকে দূষিত করবে। এর ফলে এখানকার জলজ প্রাণীগুলো নিশ্চিতভাবে হুমকির মধ্যে পড়বে। এক হিসাবে দেখা যায়, সুন্দরবনের ভেতরে হিরণ পয়েন্ট থেকে আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত ৩০ কি.মি নদী পথে বড় জাহাজ বছরে ৫৯ দিন এবং আকরাম পয়েন্ট থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৭ কি.মি পথ ছোট লাইটারেজ জাহাজে করে বছরে ২৩৬ দিন রামপাল প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় হাজার হাজার টন কয়লা পরিবহন করতে হবে। যেখানে বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচিতে সুন্দরবনের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেখানে তার ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহন কীভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

(চ) নদীর পানি প্রত্যাহার : কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিপুল পরিমাণ মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। সরকারি ইআইএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র শীতলীকরণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য পশুর নদী থেকে প্রতি ঘন্টায় ৯ হাজার ১৫০ ঘনমিটার করে পানি উত্তোলন করা হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি পরিশোধন করে ঘন্টায় ৫ হাজার ১৫০ ঘনমিটার হারে আবার নদীতে ফেরত দেয়া হবে। এর ফলে নদী থেকে প্রতি ঘন্টায় পানি উত্তোলনের পরিমাণ হবে ৪ হাজার ঘনমিটার। এ পরিমাণ পানি প্রত্যাহারের ফলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীর পলি প্রবাহ, প্লাবন, জোয়ার-ভাটা, মাছসহ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ইত্যাদির উপর প্রভাব পড়বে।

(ছ) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া : এই প্রকল্পে প্রতিদিন কয়লা ধোয়ার জন্য ২৫ হাজার কিউবিক মিটার স্বচ্ছ পানি ভূগর্ভস্থ স্তর থেকে উত্তোলন করতে হবে। ২৫ বছর এই প্রকল্পের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে, সুতরাং ২৫ বছর প্রতিদিন এই পরিমাণ পানি উত্তোলনের কাজটি চালিয়ে যেতে হবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর পরিণতিতে সুন্দরবন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবে।

সরকারি মহলের যুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

শুরু থেকে সরকার ও কিছু বিশেষজ্ঞ প্রচার চালাচ্ছে যে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি করবে না। এমনকি পরিবেশ দূষণও করবে না। কয়লার কারণে পরিবেশ দূষণ না হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ভারত-চীনের পরিবেশ রক্ষা দফতরগুলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কথা বলছে কোন যুক্তিতে? নাকি ওইসব দেশে কয়লার দূষণ হলেও বাংলাদেশে হবে না? বলা হচ্ছে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ঘরের ভেতর বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-বালু-তুরাগ নদী দূষণ আর দখলে মৃতপ্রায়। সরকারের নাকের ডগায় এসব নদীর মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। সেখানে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরের সুন্দরবনের জল-স্থলসহ পরিবেশ রক্ষা যথাযথভাবে হবে? যথেষ্ট নজরদারি থাকবে? অন্তত অভিজ্ঞতা থেকে দেশের মানুষ জানে – এটা হবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশগত বিধি-নিষেধ মেনে চলার যেসব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো বাংলাদেশের মতো দেশে কতটুকু কার্যকর হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশগত মান নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে গেলে উৎপাদন খরচ বাড়বে, অর্থাৎ বিদ্যুতের দামও বাড়বে। এসব যথাযথভাবে মনিটরিং করার মতো সক্ষম ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সর্বোপরি জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত চরিত্রসম্পন্ন সরকারের অনুপস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষা করে কাজ করার প্রতিশ্রুতি কথার কথা হয়ে থাকবে।

যে 'সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি' ব্যবহার করে সব দূষণ দূর করা হবে বলা হচ্ছে তা কতটুকু সত্য? বাস্তবতা হলো, এতে দূষণের মাত্রা সর্বোচ্চ ৮% থেকে ১০% কমে। দূষণ রোধে পাওয়ার প্ল্যান্টে যে সব প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, নিচে সেগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হলো-

প্রযুক্তির নাম	কার্যকারিতা	সীমাবদ্ধতা
এফজিডি (Flue-gas desulfurization)	SO_2 দূষণ কমায়	'এফজিডি ওয়েস্ট ওয়াটার' নামে স্লারিতে সকল দূষিত পদার্থ জমা হয়। ফলে মাটি ও পানি দূষিত হতে বাধ্য।
লো-নক্স-বার্নার (Low Nox Burner)	৩৫-৪০% NO_2 দূর করে	দাবি করা হচ্ছে ৮৭% দূর করে। এটা ঠিক ধরে নিলেও বাতাসে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব ৪৭.২ মাইক্রোগ্রাম বাড়বে। যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।
ইএসপি (electrostatic precipator)	পারদ দূর করবে ৪৮% থেকে ৬৯%	অধিকাংশ পারদ রয়ে যাবে।
ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (Watertreatment plant)	দূষিত পানিকে পরিশুদ্ধ করে পানযোগ্য করে তোলে	পশুর নদ থেকে ঘন্টায় ৯ হাজার ১৫০ ঘন মিটার পানি প্রত্যাহার করা হবে। নির্গত পানির তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ, মাছের প্রজনন ক্ষেত্র, পানির উদ্ভিদ ও প্লাঙ্কটনের জীবন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৯০০ ফুট উঁচু চিমনি	সকল দূষণকারী পদার্থসহ ধোঁয়া ৯০০ মিটার উপরে নির্গত হবে	দূষণ কমে যায় না বা ধোঁয়া মহাশূন্যে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এলাকার দূষণ কমলেও ওজোন স্তরের ক্ষতি হবে।
অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা	কী কী দূষণ হবে তা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা যাবে	কোনো দূষণ কমাবে না।

এসব প্রযুক্তির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং খোদ আমেরিকাতেই এখনও প্রায় কোনো কারখানাতে সবগুলো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় না। Union of Concerned Scientist এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Coal Power: Air Pollution' এ বিষয়টি এমনই বলা হয়েছে। কয়লা ব্যবহারের কারণ হলো কয়লা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। যদি রামপালে দূষণ প্রতিরোধে অনেক মূল্যের প্রযুক্তিই ব্যবহার করতে হয়, তাহলে কয়লা ব্যবহারের আর কোনো অর্থ থাকে না। রামপালের ইআইএ রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে যন্ত্রপাতি স্থাপনা খরচ ধরা হয়েছে ১৯৬ কোটি টাকা আর পরিচালনা খরচ হবে ২৯.৪৯ কোটি টাকা। অথচ শুধুমাত্র এফজিডি স্থাপনা খরচ এক হাজার থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা। আর স্থাপনা খরচ বাদ দিলে শুধু পরিচালনা খরচ ৮৩ কোটি থেকে ২০৮ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষমতার দম্ভ আছে জনস্বার্থের বিবেচনা নেই

গত ১৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ঘটা করে সংবাদ সম্মেলন করে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন - যত বিরোধিতাই হোক, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র হবেই। তিনি সুন্দরবন থেকে রামপাল নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত বলে দাবি করেছেন। তার তো এটা জানার কথা – ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসি খোদ ভারতেই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে পারেনি – বনভূমি থেকে ২৫ কিমি এর কম দূরত্ব ছিল বলে। অথচ সে কোম্পানিকেই সুন্দরবনের ১৪ কিমি-এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্র করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – বড় দেশ ভারতের মতো বাংলাদেশে অত দূরত্ব বজায় রাখার দরকার নেই। কয়লাভিত্তিক বিদুৎকেন্দ্রের ক্ষতির মাত্রা কি দেশভেদে কম-বেশি হয়? বরং ছোট, ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে ক্ষতি তো আরো বেশি হবার কথা।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বনের কাছে ও শহরের মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছবি দেখিয়ে দাবি করেছেন, সেখানে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তাঁর দেয়া উদাহরণের মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই ক্ষতির তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। যেমন – তাঁর উল্লেখ করা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করে আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি। ২০১৪ সালে পানি দূষণের দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়ে এই কোম্পানি জরিমানা দেয় এবং একটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ ও দু'টিতে দূষণ কমানোর অঙ্গীকার করে। ভিয়েতনামের কুয়াঙ্গনিন ও তাইওয়ানের তাইচুং কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দুটির বিরুদ্ধেই মারাত্মক পরিবেশ দূষণের অভিযোগ আছে। বেইজিং শহরের বড় ৪টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩টি ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়েছে, চতুর্থটি আগাম বছর বন্ধ হবে পরিবেশ দূষণ কমানোর প্রয়োজনেই।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, "আট বছর ধরে বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চলছে। কিন্তু ওই এলাকায় তো গাছপালা মরেনি, পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি।" বড়পুকুরিয়া আর রামপাল একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। রামপালের গুরুত্ব সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ঘিরে। অন্যদিকে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বড়পুকুরিয়ার চেয়ে কার্যত ১০ গুণ বড়, দৈনিক কয়লাও পুড়বে ১০ গুণ বেশি, গড়ে প্রতিদিন ১৩ হাজার টন কয়লা। আর বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা তুলে সেখানেই ব্যবহার হচ্ছে, এতে পরিবহনজনিত দূষণ এবং ক্ষতির পরিমাণ সঙ্গত কারণে কম। কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা আসবে সুন্দরবনের ভেতরের চ্যানেল দিয়ে। লাখ লাখ টন কয়লা সুন্দরবনের আকরাম পয়েন্টে বড় জাহাজ থেকে নামানোর পর (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ন্যায্য দাবি মেনে নিলে পরাজয় হয় না
গায়ের জোরে চাপানোর মধ্যেই নৈতিক পরাজয়

ছোট জাহাজে তা নিয়ে যাওয়া হবে বিদ্যুৎকেন্দ্রে। এতে দিন-রাতে কয়লা লোড-আনলোড আর পরিবহনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুন্দরবনের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাল-নালার পানি। অতি সম্প্রতি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে বড়পুকুরিয়া পানি দূষণ ও পানি সংকটের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা সরকারি ভাষ্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, যেকোনো বন আর সুন্দরবন এক নয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। আমাদের দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বুক আগলে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরবন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের বনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। সবাই জানেন, জোয়ার-ভাটার লোনা ও মিঠা পানির ওপর নির্ভরশীল

গত ১৬-১৮ অক্টোবর ২০১৫ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঢাকা - সুন্দরবন রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়

এ ম্যানগ্রোভ বন অত্যন্ত সংবেদনশীল। আর একথা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত – যত উন্নত প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক্ তা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে সৃষ্ট বায়ু, পানি ও মাটি দূষণকে পুরোপুরি রোধ করতে পারে না।

আন্দোলনকারীদের অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন। তার ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য সম্ভবত তাঁর নিজের দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। ন্যায়সঙ্গত লড়াইতে যখন মানুষ নামে, তখন টাকার লোভে সে চলে না, বিবেকের তাগদেই মানুষ আসে, দায়িত্ব নেয়। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সামষ্টিক কল্যাণ কামনা থেকে মানুষ কোনো কাজ করতে পারে, জনগণের অর্থসাহায্যে কোনো আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে – এসব তাঁর ধারণার বাইরে।

প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে বিএনপি-র সমর্থনের উল্লেখ করে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ন্যায্য এই আন্দোলনকে বিতর্কিত ও কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছেন। তিনি একথা ভালো করেই জানেন – সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে এতদিন খালেদা জিয়া ছিলেন না, ছিল জনগণ। আজ রামপাল প্রশ্নে বিএনপি যে অবস্থান নিয়েছে, তার সাথে জাতীয় কমিটির বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিক লড়াইয়ের চরিত্রগত পার্থক্য সচেতন মানুষ বোঝেন। অতীতে গ্যাস-কয়লা-বন্দর রক্ষার যে আন্দোলন হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ-বিএনপির গৃহীত নীতির বিরুদ্ধেই হয়েছে। ২০০৬ সালে বিএনপির দমন-পীড়ন মোকাবেলা করেই ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। সেই রক্তস্নাত গণঅভ্যুত্থানের সময়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে তাঁর দল আন্দোলনকারীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রাখেননি।

বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান হারাবে সুন্দরবন

জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো সরকারকে স্পষ্টভাবেই বলেছে, রামপাল প্রকল্প বাতিল করতে। ইউনেসকো প্রতিনিধি দল সুন্দরবন পরিদর্শন করে ক্ষতির আশঙ্কাসমূহ রিপোর্টে পেশ করেছিল্ সরকার রিপোর্টের পাল্টা জবাব দিলে ইউনেসকো তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সতর্ক করে দিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্বাসমূলীয় এই বনের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হলে বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান হারাবে সুন্দরবন। বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা থেকে সুন্দরবন নাম লেখাবে 'বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের' তালিকায়। বিদ্যুৎকেন্দ্র, নৌপথ, প্রায় ১৫০ শিল্পকারখানা স্থাপন এবং নদী খননের ফলে সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে উল্লেখ করে তা বন্ধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলেছে এই সংস্থাটি। ইতোমধ্যে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন 'রামসার' সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়েছে এবং এ ঘটনায় সুন্দরবনকে নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছে বহুজাতিক ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগের পরামর্শ দানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংকট্র্যাক। ফ্রান্সের বৃহৎ তিন ব্যাংক বিএনপি পারিবাস, সোসিয়েতে জেনারেলি ও ক্রেডিট এগ্রিকোল এরই মধ্যে প্রকল্পটিতে অর্থায়নে আপত্তি জানিয়েছে। নরওয়ের দুটি পেনশন ফান্ডও ভারতের এনটিপিসি থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। প্রকল্পটি সম্পর্কে কাউন্সিল অন এথিকস অব নরওয়ের মন্তব্য, সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিলেও এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতি করবে।

চুক্তিটিও অসম

এতবড় ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনকে বিপন্ন করে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে জনগণের জন্যে তা কি কোনো সুফল বয়ে আনবে? হিসাব বলছে, আনবে না। এ প্রকল্পে বিদ্যুতের দাম প্রস্তাব করা হয়েছে ইউনিট প্রতি ৮-৮.৫০ টাকা, যেখানে বর্তমানে সাধারণ গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৪-৫ টাকা। এই প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৭০% অর্থ আসবে বিদেশি ঋণ থেকে, বাকি ৩০%-এর মধ্যে ভারত বহন করবে ১৫% আর বাংলাদেশ ১৫%। আর ওই ৭০ ভাগ ঋণের সুদ পরিশোধ এবং ঋণ পরিশোধ করার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের। অর্থাৎ ভারতের বিনিয়োগ মাত্র ১৫ ভাগ, কিন্তু তারা মালিকানা পাবে ৫০ ভাগ। বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনায় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এনটিপিসি-র প্রাধান্য থাকবে। অথচ বাংলাদেশের বিনিয়োগ এখানে বেশি। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন হ্রাস ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি যা কিছু হবে তার সবটাই হবে বাংলাদেশের। চুক্তি অনুযায়ী কয়লা আমদানির দায়িত্বও বাংলাদেশের কাঁধে। সময়মতো কয়লা না পাওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র কিছুদিন বন্ধ থাকলে সেজন্য ক্ষতির দায়ও বহন করতে হবে বাংলাদেশকেই।

আসলে ভারতের সাথে ট্রানজিট সংক্রান্ত আলোচনার মতো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও মহাজোট সরকার ভারতের আনুকূল্য

গত ১৬-১৮ অক্টোবর ২০১৫ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঢাকা - সুন্দরবন রোডমার্চে বাসদ (মার্কসবাদী)

লাভের চেষ্টায় জাতীয় স্বার্থে ছাড় দিচ্ছে। আমাদের নদীগুলো ভারতের পানি আগ্রাসনের শিকার। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর হাতে সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা চলছেই। এখন বাংলাদেশ ভারতকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় যোগাযোগের জন্য ট্রানজিট সুবিধা দিচ্ছে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বাংলাদেশের শাসকদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু নীতিই রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান কোন পথে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে, সরকার বারবার দেশের জন্য সর্বনাশা পথ গ্রহণ করছে। দেশের স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্রগুলো একে একে অসম চুক্তিতে (গড়ে ৭৯ ভাগ গ্যাস ওদের আর মাত্র ২১ ভাগ আমাদের) মার্কিন-ব্রিটিশ-কানাডিয় প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানিকে ইজারা দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের নিজেদের গ্যাস ওদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দরে বেশি দামে কিনতে হয়। এতে প্রতি বছর আমাদের লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। আমাদের সম্পদ লুট করতে গিয়ে কত ধরনের দুর্নীতি যে হয়েছে, নাইকোর দুর্নীতি মামলা তারই প্রমাণ। ফুলবাড়ি-বড়পুকুরিয়ার উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত অব্যাহত রাখা, বঙ্গোপসাগরের গ্যাসব্লক অসম শর্তে বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দান, রেন্টাল-কুইক রেন্টালের নামে ১৪ থেকে ১৭ টাকা কিংবা তারও বেশি দরে বিদ্যুৎ ক্রয় কিংবা হালের এই ভারতীয় বিনিয়োগে সুন্দরবন-কৃষিজমি ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি সবকিছুই জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে মুনাফা ও লুটপাটের আয়োজনের অংশ।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিকল্প প্রস্তাব দেশের বামপন্থী দল ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দিয়ে আসছেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে, পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিকায়ন করে কম্বাইন্ড সাইকেলে পরিণত করলে বর্তমানে যে পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ রয়েছে তা দিয়েই সস্তায় গোটা দেশের বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান সম্ভব। বর্তমানে ২০-২৫% সক্ষমতায় ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করে যে ৪০০০-৪৫০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, আধুনিকায়ন করা হলে একই পরিমাণ গ্যাস থেকে ৮০০০-৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সস্তায় ইউনিট প্রতি দেড় থেকে দুই টাকা খরচে উৎপাদন করা যেত। সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই এই লক্ষ্যে উদ্যোগ নিলে ২০১১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে পারতো। জরুরি উদ্যোগে ৬ মাসে পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত ও আধুনিকায়ন এবং দেড়-দুই বছরে নতুন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হলে কুইক রেন্টালের চেয়ে অনেক কুইক এবং অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ সংকটের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে সরকার রেন্টাল-কুইক রেন্টালের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের লুটপাটের ব্যবস্থা করেছে। বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সামিট, ওরিয়েন্টাল, দেশ, অটবি, এগ্রিকোসহ দেশি-বিদেশি কোম্পানির জন্য বিদ্যুৎ খাতকে লাভজনক করেছে আর দেশবাসীর ওপর বোঝা বাড়িয়েছে।

জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাপেক্স, পেট্রোবাংলা, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পঙ্গু করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে। হাতের কাছে থাকা এসব সমাধানের পাশাপাশি আশু এবং দীর্ঘমেয়াদী কিছু বিকল্প নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। সারা বিশ্ব এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। কারণ তেল, গ্যাস, কয়লা এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সবই একদিন ফুরিয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই এমন জ্বালানির সন্ধান করা দরকার, যার উৎস প্রাকৃতিকভাবে অফুরন্ত। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস যেমন উইন্ডমিল, জিওথার্মাল, সোলার এনার্জি ইত্যাদি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, সমর্থনদান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এখন অত্যন্ত জরুরি।

যুক্তির জোর হারিয়ে সরকার গায়ের জোর খাটাচ্ছে

উন্নয়ন, বিদ্যুতের উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে সরকার যেসব যুক্তি আনছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণে কোনোটিই ধোপে টিকছে না। ছাত্র-যুবক-নারী-কিশোর-বৃদ্ধসহ বিভিন্ন অংশের মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে নানা মাত্রায় প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে। গান-কবিতা-ছবি-ডকুমেন্টারি সৃজনশীল নানা তৎপরতায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে মানুষ। ভোটারবিহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দফা ক্ষমতাসীন হয়ে যখন কোনোক্ষেত্রেই সরকার জনমতের তোয়াক্কা করছে না, রামপাল বাতিলের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে সেটা আশা করা যায় না। সে কারণেই জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিল ও ভারতীয় দূতাবাসে স্মারকলিপি পেশের সর্বশেষ দুটি কর্মসূচীতেই শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা করেছে পুলিশ, আহত করে গ্রেফতার করেছে আন্দোলনের কর্মীদের। ঢাকায় সাইকেল র‍্যালিতে ছাত্রলীগ ও পুলিশ যৌথভাবে হামলা করেছে। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠনের পালিত নানা কর্মসূচীতে বাধা দিয়েছে। কখনো কর্মসূচী পালনই করতে দেয়নি। ফেসবুকে স্ট্যাটাস লেখার কারণে গ্রেফতার করে তিনমাস ধরে আটকে রাখা হয়েছে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নেতা দিলীপ রায়কে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে সিলেটের মদন মোহন কলেজের প্রদর্শনী ভেঙে দিয়েছে ছাত্রলীগ। আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র ফ্রন্টের স্টল তুলে দেয়া হয়েছে। এভাবে রামপালবিরোধী প্রচারণায় নানাভাবে বাধা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এতে কি পার পাওয়া যাবে? অতীতের কোনো ন্যায্য আন্দোলনকেই গায়ের জোরে দমানো যায়নি। ক্ষমতার মদমত্ততায়, কর্তৃত্বের দাম্ভিকতায় একথা বুঝবার বোধও সরকার হারিয়েছে - জনগণের ন্যায্য দাবি মানায় পরাজয় ঘটে না বরং গায়ের জোরে অযৌক্তিক কিছু প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার মধ্যেই নৈতিক পরাজয় ঘটে।

শুধুমাত্র সমর্থন নয়
আসুন, সুন্দরবন রক্ষায় সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলি

তাহলে, সুন্দরবন বাঁচানোর পথ কি? ন্যায্যতা ও যুক্তির এত সব কথা দিয়ে কি আমরা রক্ষা করতে পারবো সুন্দরবন? ইতিহাস বলে , স্বৈরাচারী শাসকদের কাছে এসবের কোনো মূল্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয় প্রতিরোধে মানুষ শামিল না হয়, শাসকরা মাথা নোয়ায় না। তাই আসুন, দূর থেকে কেবল সমর্থন নয়, সক্রিয় প্রতিবাদ প্রতিরোধে শামিল হয়ে সুন্দরবন বাঁচাই। দেশের ভবিষৎ রক্ষা করি।

শোষণ মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই

—— কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

গত ৭ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষের সূচনা ও পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভার জমায়েতের একাংশ। ইনসেটে বক্তব্য রাখেছেন পার্টি সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

নভেম্বর বিপ্লব ও পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষের সূচনা ও পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ নভেম্বর বিকেল ৩ টায় মহানগর নাট্যমঞ্চের কাজী বশির মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ(মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল ও কমরেড মানস নন্দী।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সভ্যতার ইতিহাসে শোষিত মানুষ বার বার মুক্তির জন্য লড়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। এক শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টে আরেক শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মহান নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছিল, সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় সমাজতন্ত্রেই কেবল শোষণমুক্তি হতে পারে। সেই নতুন সভ্যতার অভ্যুদয়কে রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, রঁম্যা রঁল্যা প্রমুখ মনীষীরা অবাক বিস্ময়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রথম শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল সে দেশের শ্রমজীবী মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ খুলে দেয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী হিটলার বাহিনীকে অকুতোভয় সাহসে রুখে দিয়েছিল। দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। যথা নিয়মে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর করতে না পারার দরুন কেবল সোভিয়েতেরই পতন ঘটেনি, মানব সভ্যতা আজ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের আগ্রাসনের কাছে অসহায়, অরক্ষিত। মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা দুনিয়া জুড়ে তাদের রক্তাক্ত নখরে মানব সভ্যতা আজ ভুলুণ্ঠিত। তাই সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই।"

বক্তারা সভায় আরো বলেন, গণতন্ত্র মানে তো জনগণের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা। কিন্তু আওয়ামী-মহাজোট শাসনে এসব আজ কথার কথা। তা নইলে রামপালে সুন্দরবন বিনাশী বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে যেখানে গোটা দেশ সোচ্চার, সেখানে সরকার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে গায়ের জোরে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছে কেন?

সভায় বক্তারা পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর র‍্যালিতে পুলিশি বাধা প্রদানেরও নিন্দা জানান। আলোচনা সভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

আমেরিকার নির্বাচন
জনগণকে বিভক্ত করে প্রতিবাদের শক্তি নষ্ট করতেই ট্রাম্পের আবির্ভাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কালো-মুসলিম-হিস্পানিক-অভিবাসীবিরোধী উগ্র আমেরিকান জাত্যাভিমান সৃষ্টিকারী বক্তব্য, নারীদের সম্পর্কে নোংরা উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নির্বাচনের আগেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমেরিকাসহ বিশ্বের বড় বড় মিডিয়ায় হিলারিই নির্বাচিত হবেন এমন একটা ভাব দেখানো হয়েছিলো। বিভিন্ন সংস্থার জরিপের ফলাফলেও হিলারি এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সব কিছু ভুল প্রমাণিত করে ট্রাম্প জয়লাভ করলেন।

আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার সমস্যা, জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি এমন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে যে, মানুষের বিক্ষোভ সেখানে ফেটে ফেটে বেরুতে চাইছে। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট' তার একটি দৃষ্টান্ত। স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অনেক মৌলিক অধিকারই আজ আমেরিকাবাসীদের নাগালের বাইরে। স্থানে স্থানে এসকল বিষয় নিয়ে অনেক বিক্ষোভ হচ্ছে যার সকল খবর আমরা পাইনা। এই বিক্ষোভ ঠেকানো ও শোষিত মানুষকে বিভক্ত করার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ট্রাম্পকে নিয়ে এলো। ট্রাম্প দেখালেন যে, আমেরিকানদের বেকারত্বের কারণ পুঁজিবাদ নয়, অভিবাসীরা অর্থাৎ যাদের দেশ আমেরিকা নয়, তাদের সংখ্যা বাড়ার কারণেই প্রকৃত আমেরিকানরা কাজ পাচ্ছে না। তিনি উগ্র আমেরিকান জাতীয়তাবাদ প্রচার করলেন। এভাবে তিনি আমেরিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের বিরাট সংখ্যক অভিবাসীদের বিরুদ্ধে, এরই সাথে সাথে কালোদের বিরুদ্ধে, হিস্পানিকদের (আমেরিকায় বসবাসকারী স্প্যানিশ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী) বিরুদ্ধে হোয়াইট আমেরিকানদের ক্ষেপিয়ে তুললেন। এককথায় মানুষের পিছিয়ে পড়া চিন্তাকে ভয়ানক মাত্রায় উত্তেজিত করেই ট্রাম্পের আগমন। এবারের নির্বাচনের প্রচারের সময়ও ছিল বিগত অন্যান্য নির্বাচন থেকে অনেক বেশি। ফলে পরিকল্পিতভাবে একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে এই ক্ষেপিয়ে তোলার কাজ চলেছে। পরস্পরের প্রতি তীব্র হিংসা ধারণকারী এই বিরাট শ্রমজীবী মানুষ এখন বেশ কিছুদিন ধরে নিজেদের বিভক্ত করে রাখবে। আমেরিকার সমস্ত রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মূল যে পুঁজিবাদ, তাকে চিহ্নিত করে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামা সাময়িকভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ট্রাম্পের আগমনে সারা বিশ্বে যে একটা গেল গেল রব পড়ে গেছে, তারও কোনো ভিত্তি নেই। ট্রাম্প বা হিলারি যেই আসুন না কেন এতে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে যে কোনো পরিবর্তন হবে না, তা আমেরিকান পত্র-পত্রিকায়ও বারবারই এসেছে। ট্রাম্পের বিপরীতে হিলারিকে সাধু সাজাবার চেষ্টাও হাস্যকর। হিলারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালেই বিভিন্ন দেশের উপর আমেরিকা চড়াও হয়েছে, আগ্রাসন করেছে, মধ্যপ্রাচ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। চরম সংকটগ্রস্থ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার যুদ্ধ ছাড়া দম নেয়ারও উপায় নেই। তাই উগ্র কিংবা মিষ্টি - যে রূপ নিয়ে যে প্রেসিডেন্টই আসুন না কেন তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সেবা করতেই আসবেন, তাকে রক্ষা করতেই আসবেন। ট্রাম্প বা হিলারির এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ট্রাম্প এলেন বলে আমেরিকান সমাজের বিভক্তি এত তুঙ্গে ওঠেনি বরং বিভক্তি এত তীব্র করার দরকার পুঁজিপতিদের ছিলো বলেই ট্রাম্প এলেন।

গাইবান্ধায় আদিবাসী হত্যা ও অগ্নিসংযোগ-লুণ্ঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ১০ নভেম্বর'১৬ বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ভূমির দাবিতে আন্দোলনরত আদিবাসী হত্যা ও অগ্নিসংযোগ-লুণ্ঠনের ঘটনার বিচারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ১০ নভেম্বর'১৬ বিকেল সাড়ে ৪ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক প্রমূখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলার ক্ষত না শুকাতেই আবার আদিবাসীদের উপর ভয়াবহ হামলা প্রত্যক্ষ করলো দেশের মানুষ। স্বঘোষিত মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ান দাবিদার বর্তমান মহাজোট সরকারের শাসনামলে একের পর এক সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জীবন সম্পদ অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। একসময় জোরপূর্বক উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসীদের ভিটা ফিরে পাবার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চললেও সরকার কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু, পিতৃপুরুষের ভিটা ফিরে পাবার দাবিতে আন্দোলনরত আদিবাসীদের ওপর প্রশাসনের ছত্রছায়ায় যে হামলা চালানো হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় বর্বরতারই আরেকটি নজির। চিনিকলের জন্য প্রয়োজন না হলে যে জমি আদিবাসীদেরই ফেরত দেবার কথা ছিল, সে কথার বরখেলাপ করে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সরকারি দল সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে বেআইনীভাবে লীজ দিয়েছে। আদিবাসীদের কাছে ভিটা ফিরিয়ে না দিয়ে প্রশাসন দখলদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য বর্বর নির্যাতন চালিয়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটালো তা অত্যন্ত ভয়াবহ। বর্তমানে মহাজোট সরকার যেকোনো প্রতিবাদ আন্দোলন অত্যন্ত ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমন করছে যাতে কোনো ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই ভয়াবহ হামলার সাথে জড়িত পুলিশ সদস্য ও দখলদারদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচারের আওতায় এনে শাস্তির দাবি করেন এবং একই সাথে গণতন্ত্রমনা ও সকল সচেতন মানুষদের সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org